এঁদের বিরোধী ছিল একটি গোষ্ঠী, যাঁরা হলেন 'Independents'। তাঁদের মধ্যে অনেকেই Puritan ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন ধর্ম মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়, যেখানে রাজার ধর্মমতের কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই।

সাম্প্রতিককালে David Underdown তাঁর Pride's Purge নামে বইতে হেক্সটার-এর ১৯৪০-এর গবেষণার উল্লেখ করে বলতে চেয়েছেন যে পার্লামেন্টের এই দ্বিবিধ বিভাজনের চিত্রে Long Parliament-এর গোষ্ঠী বিন্যাসের জটিলতা ধরা পড়ে না। হেক্সটার-এর মত হল Independents ও Presbytenian-দের মাঝামাঝি একটি তৃতীয় গোষ্ঠী ছিল। তিনি এদের বলেছেন Presbetyenian Independents। John Pym-কে তিনি এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত করেছেন যাদের দুই বিবদমান গোষ্ঠীর মধ্যে ছিল মধ্যবর্তী অবস্থান। Allan Everitt আর এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন যে পার্লামেন্টের এই ত্রিমুখী বিভাজনের গৃহযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাসে কোনো প্রাসঙ্গিকতা ছিল না। জন মরিল-এর Revolt of The Provinces-এরও এটাই বক্তব্য। এককেটি কাউন্টিতে রাজা-প্রজার দ্বন্দ্বের চরিত্র একেক রকম। গৃহযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাসের যতই ব্যতিক্রমী চিত্র হোক না কেন পার্লামেন্টের এই ত্রিমুখী বিভাজনের বিশ্লেষণ গ্রহণযোগ্য। ডেভিড আণ্ডারডাউন লিখছেন পিউরিটানপন্থী পার্লামেন্টের বেশির ভাগ সদস্যেরই গৃহযুদ্ধের সূচনাপর্বে ছিল একটি মধ্যবর্তী অবস্থান। গৃহযুদ্ধের পুরো সময়টা জুড়েই এদের দেখতে পাওয়া যায়, যদিও ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে সেই অবস্থান পাল্টানোর সম্ভাবনাও যথেষ্ট প্রবল ছিল। সমস্ত রাজনৈতিক প্রশ্নেই গোষ্ঠীগুলির অনুগামীরা যে একই মত পোষণ করতেন, তাও নয়। তবুও নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে শেষ পর্যন্ত রাজশক্তির সঙ্গে সমঝোতা করে একটি ব্যাপক রাজনৈতিক বিপ্লবের পন্থা তাঁরা পরিহার করতে চেয়েছেন। একটা সময় এসেছিল যখন Independent গোষ্ঠীর এক অংশ তাদের সাধারণ অনুগামীদের চাপে তাদের অবস্থান পাল্টাতে বাধ্য হয়। এই প্রেক্ষিতে যখন মধ্যপন্থী ও উগ্রপন্থীদের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠল রাজবিরোধিতার প্রশ্নে, সেই সন্ধিক্ষণে গৃহযুদ্ধের একটি বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটেছিল। Independents-রা যে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ল তার কারণ শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলাদলি নয়। Independents-দের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যারা অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন পরিবারের মানুষ তাঁরা গৃহযুদ্ধকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতায় বিপন্ন বোধ করেছেন। কিন্তু যাঁদের ততটা সামাজিক প্রতিষ্ঠা বা আর্থিক সাচ্ছন্দ্য ছিল না তাদের চিন্তাধারা অনেক বেশি বিপ্লববাদী ছিল। এবং তাদের এই বিপ্লবপ্রচেষ্টায় সহযোগী হয়েছিল শহর ও গ্রামাঞ্চলের বিক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ।

পার্লামেন্ট যখন এই দুই বিরোধী মতে দ্বিধাবিভক্ত, সেই নাটকীয় সংঘাতের মুহূর্তে সামরিক নেতৃত্বের একটা বৈপ্লবিক ভূমিকা ছিল। পার্লামেন্টের বাহিনীর সমরনায়কেরা, যার মধ্যে ক্রমওয়েল, ফেয়ারফ্যাক্স এবং হেনরি আয়ার্টন ছিলেন, তাঁরা মনে করতেন এই বিরোধের নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে যেকোনো সমঝোতার ক্ষেত্রেই সামরিক নেতৃত্বের মতামতের একটা মূল্য আছে। তাঁদের সেনাবাহিনীতেও নানা কারণে তখন অসন্তোষ

দেখা গিয়েছিল। সৈন্যরা অনেকদিন হল বেতন পাচ্ছিল না, আবার অনেকেই ভাবছিল যে রাজার সঙ্গে পার্লামেন্টের সমঝোতা হলে রাজদ্রোহ করার অভিযোগে তাদের শাস্তি হবে। এই সাধারণ সেনানীর দল বিপ্লবের গতি ত্বরান্বিত করেছিল। এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল একদল Leveller গোষ্ঠীভুক্ত গণতন্ত্রবাদী বিদ্রোহী। এ সময়ে এঁরা বলতে শুরু করেন যে ইংরেজদের জন্মগত স্বাধীনতা রক্ষার কাজে পার্লামেন্টের থেকে অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য হল সমরবাহিনী বা নিউ মডেল আর্মি। সমরবাহিনীর এমনই একটি গোষ্ঠী হঠাৎ ১৬৪৭-এর গ্রীষ্মকালে রাজাকে বন্দি করল। সামরিক নেতৃত্ব এই ছোটখাটো বিদ্রোহগুলি দমন করতে সক্ষম হলেও গৃহযুদ্ধের রাজনীতিতে Leveller-পন্থীদের উত্থান একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছিল।

Leveller-দের সঙ্গে পার্লামেন্টের প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের মতভেদের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে পাটনি (Putney)-র সাংবিধানিক বিতর্কে। উত্তর ইংল্যান্ডের একটি ছোট্ট শহর Putney-র চার্চ প্রাঙ্গণে এই বিতর্ক হয়েছিল। এই সাংবিধানিক বিতর্কের প্রসঙ্গে পরে আসছি। পাটনির বিতর্কের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই বিরোধীদের মধ্যে আদর্শগত বিরোধের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল। বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর সাধারণ সেনানী ও কিছু অসামরিক উগ্রপন্থী নেতাদের সহযোগিতায় গড়ে উঠেছিল লেভেলার আন্দোলন। এই অসামরিক লেভেলারদের নেতৃত্বে ছিলেন জন লিলবার্ন (John Lilburne)-এর মতন ব্যক্তিত্ব। তাঁর সঙ্গে ক্রমওয়েলের মতবিরোধের জেরে লিলবার্নকে কিছুদিন বন্দিদশা ভোগ করতে হয়। পাটনির বিতর্কের আগেই রিডিং-এ (Reading) এই মতদ্বৈধের এক প্রস্থ মহড়া হয়ে গিয়েছিল। উগ্রপন্থী সৈন্যরা দাবি করেছিলেন যে নরমপন্থী প্রেস্‌বাইটারিয়ানদের নিয়ন্ত্রণ থেকে পার্লামেন্টকে মুক্ত করে রাজার বিরুদ্ধে একটি সর্বব্যাপী সংঘর্ষে লিপ্ত হতে। সেনাবাহিনীর নেতৃবৃন্দ তখনও চাইছিলেন রাজার সঙ্গে আলোচনার পথ খোলা রাখতে। এই দোলাচলের মধ্যে লিলবার্ণ লেভেলারপন্থীদের সংগঠিত করেন। তাদের জনসমর্থনের মূলে ভিত্তি ছিল লন্ডনের নিম্নবিত্ত মানুষেরা। লিলবার্ণের একজন অনুগামী জন ওয়াইল্ডম্যান (John Wildman) ১৬৪৭-এর অক্টোবর মাসে একটি প্রচার পুস্তিকায় রাজার সঙ্গে সমঝোতার বিরোধিতা করেন। 'The Case of The Army truly stated' নামাঙ্কিত প্রচার পুস্তিকায় বক্তব্য ছিল 'রক্ত দিয়ে যে অধিকার সাধারণ মানুষ অর্জন করেছে, তার বিনিময়ে কোনো সমঝোতা গ্রহণীয় নয়'। দাবির মধ্যে ছিল সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক অধিকার, নির্বাচনবিধির সংস্কার, নিম্নবিত্ত মানুষের স্বার্থে করব্যবস্থার সংশোধন, একটি নির্দিষ্ট সময়ে পার্লামেন্টের নির্বাচন ও রাজার অনুগ্রহ ছাড়াই সংসদের স্থায়িত্ব।

স্বভাবতই সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ সেনানীরা এই 'Agitator'-দের সম্বন্ধে বিরূপ ছিলেন। ফেয়ারফ্যাক্স ও ক্রমওয়েলের-এর দৃষ্টিতে এরা ছিল নৈরাজ্যবাদী। বিদ্রোহীদের মধ্যে এই মতাদর্শের সংঘাত আরও প্রকট হয়েছিল পাটনির বিতর্কে। কিন্তু এই বিতর্কের সূত্র ধরে যে লেভেলার-পন্থী আন্দোলনের প্রসার ঘটেছিল, তার সামাজিক ভিত্তি ছিল

অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্গের মানুষ, মূলত ছোটখাটো সম্পত্তির মালিক। সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দাবি করা ছাড়াও রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি পরিবারের কর্তার জন্য ভোটাধিকার দাবি করা হয়েছিল। পাটনি-র বিতর্কে ভোটাধিকার দাবি করে তাঁরা যে বিভিন্ন পুস্তিকা বার করেছিলেন, তা পূর্ণতা পায় একটি সাংবিধানিক দলিলে, যা 'Agreement of the People' নামে পরিচিত। সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডের ইতিহাসে এই দলিলের একটা তাৎপর্য আছে। এটা বোঝা গিয়েছিল যে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক জীবনে একটা গণজাগরণ ঘটছে। রাষ্ট্রীয় জীবনে যারা এতদিন বাকরুদ্ধ ছিল, তাদের মতামত গুরুত্ব পাচ্ছে। পার্লামেন্টের বাহিনীর সাধারণ সৈনিক শূন্য হাতে এই বিতর্ক থেকে ফিরতে অপারগ ছিল এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র মানুষেরও যে রাজনৈতিক অধিকারের দাবি রয়েছে, 'Agreement of the People'-এর এই মতবাদ স্বীকৃতি পেয়েছিল। লেভেলার-রা বলতে চেয়েছিলেন, সাধারণ মানুষের সম্মতি ব্যতীত কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থাই গ্রহণযোগ্য নয়।

লেভেলার গোষ্ঠীর নেতৃত্ব বলতে চেয়েছেন রাজশক্তি ঈশ্বর সৃষ্টি করেননি। রাজা ও প্রজার সম্পর্কের মাত্রাগুলি নির্ধারণ করেছে একটি সামাজিক চুক্তি। কিন্তু এই চুক্তি শুধুমাত্র ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে রাজা ও প্রজার দ্বিপাক্ষিক চুক্তি নয়। রাষ্ট্রশক্তির মূলে রয়েছে সাধারণ মানুষের নিজেদের মধ্যে 'agreement' বা সম্মতি। যে কোনো শাসক—সে রাজাই হোক বা জনপ্রতিনিধি যদি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন তা হলে তাঁরা এই সম্মতি থেকে বঞ্চিত হন ও তাদের শাসন অবৈধ হয়ে যায়। সময়ে সঙ্গো সঙ্গো নতুন করে এই সম্মতির শর্তগুলির নবীকরণ প্রয়োজন, যাতে নির্বাচিত প্রশাসকদের হাতে রাজ্যশাসনের ক্ষমতা দেওয়ার সময় স্থির করা হবে তাদের ক্ষমতার সীমা। একজন ব্যক্তির বারবার প্রশাসনিক পদে নির্বাচিত হওয়া অভিপ্রেত নয় এবং সাধারণ মানুষের অনুমোদন ছাড়া প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠান বৈধ নয়। লেভেলারদের এই চিন্তা উনিশ শতকের উদারবাদী গণতান্ত্রিক চেতনার পূর্বাভাষ বলা যেতে পারে। রাজশক্তির ক্ষমতার সীমা চিহ্নিত করার প্রশ্নটি এই জাতীয় চিন্তার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে। প্রায় অর্ধশতক পরে লকের রাষ্ট্রদর্শনে আমরা এর প্রতিধ্বনি শুনতে পাই।

১৬৪৭ সালের নভেম্বর মাসে লেভেলাররা তাঁদের প্রচার পুস্তিকা 'Agreement of the People'এ যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন তার মৌলিক অঙ্গা ছিল জনসাধারণের অধিকার সম্বলিত একটি লিখিত সংবিধান, সরকারের পরিচালনায় সংসদের আধিপত্য ও সমস্ত স্তরে আইনের শাসন, তাঁদের দাবি ছিল ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে আইনের চোখে সবাই সমান হবে ও সম্পত্তির মালিক না হলেও একজন ব্যক্তির প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার থাকবে। দেশের আইন মানুষের মৌলিক অধিকারগুলির সুরক্ষা বিধান করবে। আর পার্লামেন্ট ঠিক করে দেবে কারা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে দেশ শাসন করবেন।

নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক চেতনা সমৃদ্ধ এক আধুনিক রাষ্ট্রের কল্পনা, যে রাষ্ট্রে সাধারণ মানুষের স্বার্থ ও সত্তার একটি জায়গা আছে, লেভেলার নেতা লিলবার্ন যাদের বলেছেন

"hobnails, clouted shoes, private soldiers, leather and woolen aprons, and the laborious and industrious people of 'England'। এঁরাই বিপ্লবের সমর্থনে লন্ডনের রাস্তায় বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। ক্রিস্টোফার হিল বলছেন যে এরা ছিলেন ত্রয়োদশ শতকের চার্চ বিরোধী ললার্ডদের উত্তরসূরী। ললার্ডেরা এ্যাংলিকান চার্চ সংগঠিত হলে গোপন ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসাবে টিকে ছিল। হিল দেখাছেন যে ইংল্যান্ডের এসেক্স বাকিংহাম শায়ার বা কেন্টের মতন যে সমস্ত অঞ্চলে ললার্ড আন্দোলন শক্তিশালী ছিল, সেখানেই লেভেলার বা সাম্যবাদী ডিগারদের (Diggers) প্রভাব বেশি ছিল। লেভেলারদের অনেকেই অ্যানাব্যাপটিস্ট মতবাদের অনুরাগী ছিলেন। তাদের ধর্মভাবনাতেও আমরা একই গণতান্ত্রিক অভিব্যক্তি দেখতে পাই। Independentsরা যখন মানুষকে সদ্ধর্মে বিশ্বাসী ও অধার্মিক এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করতে অভ্যস্ত ছিলেন, লেভেলার মতাবলম্বীরা ভাবতেন সকল মানুষই ঈশ্বরের কৃপার যোগ্য ; ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সকলেই সমান।

ধর্মীয় বিশ্বাস তাঁদের বৈপ্লবিক চেতনাকেও সঞ্জীবিত করেছিল। তাঁদের বিশ্বাস ছিল 'ঈশ্বরবিরোধী' রাজা চার্লসের শাসনের অবলুপ্তি ঘটিয়ে ঐশ্বরিক অনুশাসন পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার আগে সমস্ত কিছু ওলট পালট হয়ে যাবে। মহাপ্রলয়ের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে এক নতুন সৃষ্টির কল্পনাপ্রসূত বৈপ্লবিক চেতনা ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেই প্রোথিত ছিল। ধর্মবোধ থেকে রাজদ্রোহ আর এই রাজদ্রোহিতার হাত ধরে এসেছিল এক ধরনের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পরিভাষা।

বিশ্বের ইতিহাসে সম্ভবত লেভেলার আন্দোলনই প্রথম গণতান্ত্রিক আন্দোলন। স্বভাবতই রাজদ্রোহী নেতৃত্বের কাছে এই উগ্রপন্থী গণতান্ত্রিক চেতনা গ্রহণযোগ্য ছিল না এবং ফলে তারা সংঘবদ্ধভাবে এই আন্দোলন দমন করে। লেভেলার মতবাদ কতটা গণতান্ত্রিক রাজনীতির ইঙ্গিতবাহী ছিল, তা নিয়ে অবশ্য বিতর্ক আছে। কেউ কেউ মনে করেন যে লেভেলার-পন্থীরা সাধারণ মানুষের ভোটাধিকারের কথা বললেও একেবারে সম্পদহীন নিঃসম্বল মানুষের কথা তাদের মাথায় ছিল না। এই দ্বিতীয় শ্রেণির সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রতিভূ ছিল ডিগার-পন্থীরা, যারা নিজেদের True Levellers বলে দাবি করত। গৃহযুদ্ধের এই উগ্রপন্থী বিপ্লববাদীদের সামাজিক ভিত্তি ও মতাদর্শ আলোচিত হয়েছে ক্রিস্টোফার হিল-এর নানা রচনায়। ক্রিস্টোফার হিল বলছেন ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধের কালে দুটে বিপ্লব ঘটেছিল। একটি বিপ্লব যা সফল হয়েছিল, তা হল সম্পন্ন বণিক এবং শিল্পপতিদের সমর্থনপুষ্ট উচ্চবর্গীয় বুর্জোয়াদের বিপ্লব। তারা রাজশক্তির ক্ষমতা সঙ্কুচিত করে যেভাবে রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংসদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করল, তার ফলে বুর্জোয়াদের শ্রেণিশাসন ইংল্যান্ডের মাটিতে প্রথম অঙ্কুরিত হল। আর একদিকে ছিল সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী চেতনায় সমৃদ্ধ বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা, যা ব্যর্থ হয়েছিল। ইংল্যান্ডের বিপ্লব নিরঙ্কুশ রাজশক্তিকে পরাস্ত করেছিল ঠিকই, কিন্তু সেখানে রাষ্ট্রব্যবস্থার কোনো গণতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটেনি।

ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধের ইতিহাস চর্চায় হিল হলেন টনি-র উত্তরসূরি। সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস এবং শ্রেণিদ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে তিনি ইংল্যান্ডের সপ্তদশ শতকের রাষ্ট্রীয়

সংকটকে ব্যাখ্যা করেছেন। হিল-এর প্রাথমিক বক্তব্য ছিল যে যাকে ঐতিহাসিকরা Puritan Revolution বলেছেন, তার মধ্যেই পুঁজিবাদী চেতনা নিহিত ছিল। শুধুমাত্র সাংবিধানিক সংকটের আঙ্গিকে ইংল্যান্ডের বিপ্লবকে ব্যাখ্যা করা যায় না। টনি-র থেকে একধাপ এগিয়ে হিল-এর সিদ্ধান্ত হল যে গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র যে সনাতন সামন্ত শ্রেণি এবং বুর্জোয়াদের মধ্যে সংঘাত ঘটেছিল তার নয়, সামগ্রিকভাবে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক জীবনে এই পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। পার্লামেন্টের পক্ষে চার্লসকে পরাজিত করা সম্ভব হয়েছিল কারণ গ্রাম ও শহরের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষ পার্লামেন্টের পেছনে ছিল। গৃহযুদ্ধের পূর্ববর্তী পর্যায়ের সমাজ মূলতঃ সামন্ততান্ত্রিক ছিল, কারণ রাষ্ট্রক্ষমতা ছিল রাজার অনুগত ভূস্বামী শ্রেণির হাতে। বণিক শ্রেণির সমর্থনে শক্তিশালী পার্লামেন্ট এই সামন্তবাদী সামাজিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যকে ধ্বংস করে বুর্জোয়া, পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা উত্থানের পথ প্রশস্ত করেছিল। পরে অবশ্য হিল টনি-কে অনুসরণ করে ষোড়শ শতকেই পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের সম্ভাবনার কথা বলেছেন। হিল গৃহযুদ্ধের যে বৈপ্লবিক প্রভাবের কথা বলেন, তাঁর বহু লেখায় এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে শ্রেণি-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই বিপ্লবের পটভূমির কথা হিল বলছেন, তা শুধুমাত্র আর্থিক স্বার্থের সংঘাত নয়। 'Society and Puritanism in Pre-revolutionary England' গ্রন্থে হিল বলতে চাইছেন যে শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে পিউরিটান মতের প্রসার ঘটেনি। পিউরিটানবাদের মধ্যে এমন কিছু ছিল যা এই মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী শ্রেণির মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। পিউরিটানদের রাজদ্রোহী মানসিকতা শুধুমাত্র চার্লসের তথাকথিত ক্যাথলিক-প্রবণতার বিরোধিতা ছিল না, পিউরিটানবাদে যেভাবে কায়িক শ্রমের গুণগান করা হয়েছিল, তা নিম্নবর্গের মানুষকে স্বভাবতই প্রভাবিত করে। হিল-এর অভিনবত্ব আমরা দেখি যখন সামগ্রিকভাবে ইংল্যান্ডের নিম্নবর্গের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনে পিউরিটানবাদ যে একটা বিকল্প সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল, তার মধ্যে থেকে তিনি বিপ্লবের উৎস সন্ধান করছেন। তাঁর 'Intellectual Origins of the English revolution'-এ তিনি দেখাচ্ছেন কিভাবে এই বিকল্প সংস্কৃতি নতুন চেতনার জন্ম দিচ্ছে। বিজ্ঞান চর্চা, ইতিহাস চর্চা, আইনশাস্ত্রের পড়াশুনা — সব কিছুর মধ্যেই এই নতুন চেতনার প্রতিবিম্ব তিনি দেখতে পেয়েছেন। কি ধরনের মানুষ এই চেতনার মূল প্রবক্তা ছিলেন সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আবার ফিরে আসছেন মধ্যবিত্ত, বৃত্তিজীবী শ্রেণির কাছে। Francis Bacon, Walter Raleigh কিংবা Edward Coke অভিজাত শ্রেণির মানুষ ছিলেন না। প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বাইরে থেকেই তাঁরা তাঁদের বিদ্যাচর্চা করেছিলেন। এডওয়ার্ড কোক ইংল্যান্ডের আইনের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এক প্রাচীন শাসনতন্ত্রের কথা বলেন, যেখানে রাজা ছিলেন সাধারণ প্রজার দ্বারা নির্বাচিত শাসক। রাজা ও প্রজার মধ্যের একটা চুক্তির কথাও এডওয়ার্ড কোক বলেন, যার কোনো ঐতিহাসিক সত্যতা না থাকলেও রাজদ্রোহীদের প্রেরণা হিসাবে তার একটা বড় ভূমিকা ছিল।

C. Hill → 1) The English Revolution.
2) A Century of Revolution.
3) Intellectual Origins of the English Revolution.

হিল-এর মূল বক্তব্য হল যে এই বিকল্প চেতনার যাঁরা প্রবক্তা, তাঁরাই গৃহযুদ্ধকে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। আপাতদৃষ্টিতে এই বক্তব্য টনি-র চিন্তার প্রতিধ্বনি। কিন্তু ক্রিস্টোফার হিল যেভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির চেতনার দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন, তাতে গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা একটা নতুন মাত্রা পেয়েছিল। একইসঙ্গে তিনি দেখাচ্ছেন যে সম্পন্ন বণিক ও শিল্পপতিদের রাজদ্রোহের পাশাপাশি আর একটা বিপ্লবও ঘটছিল, যা সাধারণ মানুষের বিপ্লব। এই বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু আধুনিক পৃথিবীতে গণতন্ত্রের উত্থানের সঙ্গে ইংল্যান্ডের এই বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। এই গণ-বিপ্লবের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল একটা নাটকীয় মুহূর্তে, যখন পার্লামেন্টের সংগঠিত সাধারণ সৈনিকেরা তাদের নানান প্রচার-পুস্তিকার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার দাবি করলেন। Agreement of the People-এর মধ্যে কতটা গণতান্ত্রিক চেতনা ছিল, তা নিয়ে বিতর্ক চলছে। অনেকেই বলেন এই সৈনিক দল, যাঁরা নিজেদের লেভেলার বলে পরিচয় দিতেন, তাঁরা সম্পদহীন মানুষের রাজনৈতিক অধিকারের কথা ভাবেননি। তাঁদের মূল ভাবনা ছিল কি করে ছোট ছোট সম্পত্তির মালিকদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার সুরক্ষিত করা যায়। হিল অবশ্য দেখাচ্ছেন কিভাবে এই লেভেলার আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই একটা সাম্যবাদী সমাজভাবনার উত্থান ঘটছিল। যাঁরা সামাজিক সাম্যের কথা বলছেন, এঁরা হলেন ডিগার্স, জেরার্ড উইনস্ট্যানলি-র অনুগামী। লেভেলার-রা যদি গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা বলে থাকেন, তাহলে ডিগার-রা এঁদের থেকে একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলছেন যে সমাজে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে গেলে ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ ঘোচানো আবশ্যিক। হিল এঁদের উল্লেখ করে বলছেন যে ইংল্যান্ডের বিপ্লবের কালে একটা সাধারণ মানুষের বিপ্লব ঘটছিল। এর প্রায় দেড়শো বছর বাদে ফরাসি বিপ্লবে এই চেতনার পুনরাবির্ভাব ঘটেছিল।

লেভেলারপন্থীদের গণতান্ত্রিক চেতনার সঙ্গে ক্রমওয়েলের মতন সেনাবাহিনীর কর্তাদের মৌলিক পার্থক্য ছিল। লেভেলারপন্থীরা যেখানে সাধারণ মানুষের মতামতের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন, ক্রমওয়েল বিশ্বাস করতেন ঈশ্বরের দ্বারা নির্বাচিত কতিপয় সচেতন শুদ্ধবাদী মানুষই—'Godly minority'—রাজনৈতিক জীবনে নেতৃত্বের অংশীদার। ১৬৪৭ এর ২৮শে অক্টোবরে শুরু হয়ে পাটনির বিতর্ক তিন দিন ধরে চলে। ক্রমওয়েল এই বিতর্কের সময় বোঝাতে চেয়েছিলেন যে উর্ধ্বতন নেতৃত্বের আদেশ শিরোধার্য করা সাধারণ সৈনিকের কর্তব্য। অন্যদিকে উগ্রপন্থীদের সন্দেহ ছিল যে সেনাবাহিনীর কর্তারা গোপনে রাজার সঙ্গে সমঝোতা করে নেবেন। সেনানায়ক হেনরি আয়ার্টন যে ভাবে দেশের প্রাচীন সংবিধানের দোহাই দিয়ে রাজার সঙ্গে সমঝোতার কথা বলছিলেন, তাতে এই সন্দেহ আরো বেড়েছিল। অনেকের মতই আয়ার্টন ভাবতেন ইংল্যান্ডের সনাতন শাসনতন্ত্রে রাজতন্ত্র একটি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান ; প্রাচীন সংবিধানের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই রাজশক্তিকে বাদ দিয়ে কোনো শাসনতান্ত্রিক বন্দোবস্ত দেশের ঐতিহ্যের বিরোধী। উল্টোদিকে উগ্রপন্থী বিদ্রোহীদের মত ছিল, রাষ্ট্রের ক্ষমতায় একমাত্র উৎস হল সাধারণ

মানুষ ও তাদের প্রতিনিধিরা। যে শাসনবিধির ভিত্তিতে রাজতন্ত্রের অধিকার বৈধতা পেয়েছিল, সেই শাসনবিধি নর্মান আক্রমণের সময়ে ইংল্যান্ডের আদি জনগোষ্ঠীগুলির ওপর আরোপিত হয়েছিল। নর্মান আক্রমণের কালে পরাজয়ের মুহূর্তে ইংল্যান্ডের মানুষের স্বাধিকার ধ্বংসের মাধ্যমেই রাজশক্তির ক্ষমতা বিস্তার ঘটেছিল। ইংল্যান্ডের ইতিহাসের এই বিকল্প বিশ্লেষণ ছিল রাজতন্ত্র বিরোধীদের অন্যতম প্রধান অস্ত্র।

ফলে রাজদ্রোহীদের একাংশের চাপে রাজার সঙ্গে সমঝোতার পথ ক্রমশঃ সংকুচিত হচ্ছিল, যদিও সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব সেই পথ একেবারে বন্ধ করে দিতে চাননি। ১৬৪৭-এর নভেম্বর মাসের এই নাটকীয় সংঘাতের মুহূর্তে সেনানায়কদের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন ছিল উগ্রবাদী আন্দোলন দমন করা। সাধারণ সেনানীদের বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দিয়ে তাদের শান্ত করার চেষ্টা হয়। Agreement of The People-এর দাবিগুলির কিছু কিছুর ক্ষেত্রে সেনানায়কেরা তাঁদের সম্মতি দিয়েছিলেন। ভৃত্য ও ভিক্ষুক ছাড়া নিম্নবিত্ত মানুষদের ভোটাধিকারের প্রশ্নটি পার্লামেন্টের বিবেচনার জন্য পাঠাতে তাঁরা সম্মত হন। ক্রমওয়েলের উদ্দেশ্য ছিল কোনোভাবে সাধারণ সৈন্যদের এই আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করা। লেভেলাররা ভাল করেই তা বুঝেছিলেন ও সৈন্যদের বোঝাতে চেয়েছেন অর্থের বিনিময়ে স্বাধীনতার দাবিগুলি জলাঞ্জলি দেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত সাধারণ সেনাদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় ভাঁটা পড়েছিল, যদিও লন্ডন শহরে নিম্নবিত্ত কারিগর শ্রেণির মানুষের মধ্যে থেকে লেভেলার আন্দোলনের প্রতি যথেষ্ট জনসমর্থন অব্যাহত ছিল। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি লন্ডনের লেভেলার নেতৃবৃন্দ হাউস অফ কমন্সে 'Agreement'-এর বিষয়বস্তু নিয়ে বিতর্কের দাবি করলেন। তত দিনে সেনাবাহিনীর বিদ্রোহী সেনারা ছাউনিতে ফিরে গেছে ও সেনাবাহিনীর কিছু উগ্রবাদী অফিসারকে সামরিক বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অনুকূল অবস্থার সুযোগ নিয়ে ক্রমওয়েল ও তাঁর অনুগামীরা লেভেলারদের দমন করলেন। লেভেলার নেতাদের বন্দী করা হল। সেনাবাহিনীর ব্যয় হ্রাস করার যুক্তিতে বিদ্রোহী সেনাদের কর্মচ্যুতি ঘটল। পার্লামেন্টের সেনাবাহিনীর সেনার সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ কমানো হল। ১৬৪৮-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস পেয়েছিল। এর পরেও লন্ডনের লেভেলার-পন্থীরা সমানে রাজার সঙ্গে সম্ভাব্য সমঝোতার বিরোধিতা করে গেছেন।

১৬৪৮-এর নভেম্বরে আয়ার্টন যখন Remonstrance of The Army নামে একটি দাবিপত্র লিখে হাউস অফ কমন্সের উপর চাপ দিচ্ছেন যাতে রাজাকে সমঝোতায় বাধ্য করা যায়, তখন ক্রমওয়েলপন্থীরা লেভেলারদের খানিকটা কাছাকাছি এসেছিলেন। তবে তা ছিল একান্ত সাময়িক। লিলবার্ন-এর ক্রমওয়েল বিরোধিতা অব্যাহত ছিল। আর পার্লামেন্ট কখনোই 'Agreement' নিয়ে আলোচনায় বসেনি। এই অবস্থায় ১৬৪৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসে লিলবার্ন লিখলেন 'England's New Chains Discovered'। ততদিনে প্রথম চার্লসের মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়েছে ও একটি নিয়ন্ত্রিত পার্লামেন্টের মাধ্যমে ক্রমওয়েল-পন্থীরা নিজেদের শাসন বলবৎ করেছেন। লিলবার্ন এঁদেরই বলছেন 'England's New

chains'। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল লিলবার্ন-এর মৃত্যুদণ্ড। 'England's New Chains Discovered' হল লেভেলারদের স্বপ্নভঙ্গের অভিব্যক্তি।

ইংল্যান্ডের বিপ্লবের ইতিহাসে ডিগারদের আবির্ভাব ঘটছে লেভেলার আন্দোলন অবদমিত হবার পরে। ডিগার আন্দোলনের প্রাণপুরুষ জেরার্ড উইনস্ট্যানলি শুধুমাত্র রাজনৈতিক অধিকারের দাবির মধ্যে আন্দোলনকে সীমিত না রেখে এক সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ধর্মীয় পরিভাষার মধ্যেই এই সাম্যবাদী চেতনা পরিস্ফুট হয়েছিল। ১৬৪৯-৫০ সালে ক্রমওয়েলের অনুগামীরা যখন লেভেলার উগ্রপন্থীদের দমনে সফল হয়েছেন, লোকালয় থেকে দূরে উইনস্ট্যানলির অনুগামীরা কয়েকটি সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

উইনস্ট্যানলি নিজে একজন ছোটমাপের বস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন যিনি ঋণের ভারে জর্জরিত ছিলেন। উগ্রপন্থী ক্যালভিনবাদের প্রভাব তাঁর ওপরে পড়েছিল। তাঁর প্রথমদিকের রচনায় তিনি মানুষ ও ঈশ্বরের সম্পর্ক নিয়ে লিখতে গিয়ে বলেন প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের অবস্থান এবং একজন ব্যক্তির চেতনা জাগ্রত হলেই এই সত্য অনুধাবন করা সম্ভব। সংগঠিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বিরোধী মানসিকতা এই জাতীয় বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে। লেভেলার আন্দোলনের পরিমণ্ডলে রাজতন্ত্রবিরোধী ভাবনা-চিন্তাও উইনস্ট্যানলিকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

এই সব কারণে ইংল্যান্ডের চার্চ তাঁকে বহিষ্কৃত করে। এরপরে ১৬৪৯ সাল নাগাদ তাঁর অনুগামীরা লোকালয় থেকে দূরে পাহাড়ের উপর জমি আবাদ করে তাদের সাম্যবাদী সমাজ পত্তন করতে উদ্যত হয়েছিলেন। এঁরা নিজেদের বলতেন True Levellers। এই পর্যায়ে উইনস্ট্যানলির লেখায় একটি সমষ্টিবাদী সামাজিক ভাবনার প্রকাশ ঘটেছিল। প্রকৃতির সম্পদে সব মানুষের সমান অধিকার আর মানুষের সহজাত চেতনাকে আশ্রয় করে 'ঈশ্বরের সন্তানেরা' ব্যক্তিস্বার্থপ্রসূত পারস্পরিক বৈরিতা দূর করে একটি সংঘাতহীন সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম—এ জাতীয় বক্তব্য এক সমষ্টিবাদী সামাজিক আদর্শের প্রতিফলন। লেভেলার নেতৃবৃন্দ যেখানে মেয়েদের এবং ভৃত্যদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে নীরব ছিলেন, উইনস্ট্যানলি ঈশ্বরের সন্তানদের মধ্যে কোনো শ্রেণিভেদ বা লিঙ্গাভেদ করেননি। সকলেই ঈশ্বরের সন্তান। সকলেরই সমাজে ও প্রাকৃতিক সম্পদে তাই সমান অধিকার।

উইনস্ট্যানলির আদর্শ ছিল "equality, community and fellowship with our own kind"। ১৬৪৯ সালে A new year's Gift নামে একটি প্রচার পুস্তিকায় তিনি পার্লামেন্টকে আহ্বান করলেন ব্যক্তিসম্পত্তির অবলুপ্তি ঘটাতে। ১৬৫০-এ লিখেছিলেন 'Fire in the Bush'। সেখানে ব্যক্তির সম্পত্তিকে বলা হল 'Murdering Property'। যেন এক শতক পরে রুশোর বক্তব্যের পূর্বাভাষ। ঈশ্বর প্রাকৃতিক সম্পদ সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সকল সন্তানের জীবনধারনের জন্য। একজন ব্যক্তির বৈভব তাঁর অভিপ্রায় নয়। 'Fire in the Bush'-এর বক্তব্য ব্যক্তিসম্পদবিরোধী ও বাণিজ্যবিরোধী। উইনস্ট্যানলির

কাছে বাণিজ্যই ছিল বৈষম্যের উৎস। সম্পদকে অন্য লোককে বঞ্চিত করে নিজের সিন্দুকে সঞ্চয় করা পাপ। আর মহাজন হল "for any man or men first to take the earth by the power of the murdering sword from others, and then by the laws of their own making do hang or put to death any who takes the fruits of the earth to supply his necessaries"। এ হল এক পুঁজিবিরোধী সাম্যবাদী প্রত্যয় যা ১৬৪০-এর দশকের প্রলয়ের জন্ম দিয়েছিল। তাঁর Law of freedom নামে প্রচার প্রবন্ধে উইনস্ট্যানলি লিখছেন একজনের অধিকার তার প্রতিবেশীকে অধিকারহীন করতে পারে না। মানুষের চেতনা এ জাতীয় সামাজিক বৈষম্যের অযৌক্তিকতা অনুধাবন করে এমন একটি সমাজ গড়ে তুলবে যেখানে ব্যক্তিসম্পত্তি কোনো আমিত্ববোধ সৃষ্টি করেনি। এ যেন এক স্বর্গরাজ্যে ফিরে যাবার আর্তি, যেখান থেকে 'প্রথম মানুষ বহিষ্কৃত হয়েছিল'; এমন এক স্বর্গরাজ্যের কল্পনা যেখানে 'feeling of mine and thine' একজন ব্যক্তিকে তার প্রতিবেশীর থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি। এই ধর্মবোধ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল এক সাম্যবাদী প্রত্যয়, সাম্যবাদের প্রত্যয়ী উত্থানের কয়েক শতক আগে।

সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডের শহরাঞ্চলে-বিশেষ করে লন্ডনে, কারিগর শ্রেণির মানুষ এই জনবিক্ষোভে সামিল হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে উচ্চবিত্ত পরিবারগুলির প্রতি বৈরি ভাব লক্ষণীয়। শহুরে কারিগরদের মধ্যে Guild গুলি সম্পর্কে রাগ পুঞ্জিভূত হয়েছিল। 'The World Turned Upside Down'-এ ক্রিস্টোফার হিল দেখাচ্ছেন কিভাবে সপ্তদশ শতকের প্রথম থেকেই ইংল্যান্ডের সমাজ জীবনে নানা কারণে শ্রেণি সংঘাত প্রবল আকার নেয়। বেষ্টনী প্রথার প্রকোপে বহু ছোট চাষি (Cottager) জমি ও বাস্তু হারিয়ে শহরে ভবঘুরের জীবন বেছে নিয়েছিল। সে সময়ের দলিলে এদের বলা হচ্ছে masterless men-সামাজিক নিয়ন্ত্রণবিহীন একদল মানুষ যারা কোনো নিয়ম কানুন মানে না। শহরাঞ্চলে অস্থিরতার এরা একটি বড় কারণ। ১৬২০-র দশক থেকে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক অবস্থা কিছুটা খারাপ হয়েছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছিল। সর্বত্রই সাধারণ শ্রমজীবি মানুষেরা কাজ পাচ্ছিল না। এর ফলে খাদ্যাভাব ও খাদ্যদাঙ্গার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সংকট জনিত শ্রেণিদ্বন্দ্ব তীব্র হয়েছিল। শহরগুলিতে মাঝে মাঝেই এমন গণ্ডগোল বাধত যা উচ্চবর্গীয় মানুষদের উৎকণ্ঠার কারণ ছিল। তাঁদের আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না, তার অন্যতম প্রমাণ হল একজন দুঃস্থ সৈনিকের হাতে চার্লসের একজন অনুগত সভাসদ বাকিংহামের ডিউকের হত্যা। ১৬২৮ সালে এ ঘটনা ঘটেছিল। সৈন্যবাহিনীতে জোর করে নাম লেখানো নিয়েও জনরোষ সৃষ্টি হয়েছিল।

১৬৪০-এর দশকে স্থানীয় নির্বাচনের সময় নিম্নবিত্ত মানুষ যে ভাবে তাঁদের মনোনীত প্রার্থীদের জয়ী করতে সংগঠিত হয়েছিল, তা রাজনৈতিক জীবনে এক ধরনের বিপুল আলোড়নের ইঙ্গিত দেয়। ডেরেক হার্স্ট (Derek Hirst) সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে নির্বাচনগুলি কি ধরনের উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল তার আলোচনা করেছেন। হাউস অফ কমন্সের হস্তক্ষেপে স্থানীয় নির্বাচনে নির্বাচকদের সংখ্যাও ১৬২০-র পর থেকে বাড়ছিল।